Radio Serial Script No. 47 - Improvement of Transport in Big Cities

রচনা

সায়েন্স কমিউনিকেটরস্ ফোরাম – এর পক্ষে

সত্যব্রত রায় বর্ধন

শ্রুতি নাটকটির কুশীলব

অমিত, সৌম্য, চান্দ্রেয়ী, সেঁজুতি – বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী।

বিপুল গায়েন – কলকাতা পুলিশের কনেস্টবল।

শিবশম্ভু সান্যাল – পুলিশ সার্জেন্ট।

ত্রিদিব সেন – অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স অফিসার।

পর্ব – এক

[বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা, ছোটবড় চারপাঁচটা রাস্তা মিশছে এখানে, ফুটপাত খাবার, নতুন-পুরনো বই, মোবাইলের, ফলের দোকান, ফলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এরই মাঝে -]

অমিত – (কোঁকাতে কোঁকাতে) আরে আরে এই যে দাদা আপনারই আবার এতো জোশ কিসের? বলছি না আমার দোষ। ড্রাইভারের দোষ নেই!

সৌম্য – এই এক পাবলিক, হাত নিসপিস করে এদের। সুযোগ পেলেই এদের হাত চলে।

অমিত – (কোঁকাতে কোঁকাতে) শুধু-মুধু অটো ড্রাইভারকে মারছেন দাদা।

সৌম্য – (ধমকে) কী মশাই কথা কানে যাচ্ছে না?

চান্দ্রেয়ী – কীরে কোথায় ব্যথা -

সেঁজুতি – কনুইতে –

চান্দ্রেয়ী – ও বাবা, এ তো রক্ত, দাঁড়া – সৌম্য আমার ওড়না দিয়ে বাঁধ আগে।

সেঁজুতি – খুব ব্যথা করছে উরে – উরে বাবা, আঃ মাগো –

বিপুল – (খুব গম্ভীর, নিরুত্তাপ গলায়) তা একটু ব্যথা তো করবেই ম্যাডাম।

সৌম্য – সার্জেন্ট সাহেব, একটু ফার্স্ট এড।

বিপুল – হবে হবে, সব হবে। আসল সার্জেন্ট সাহেব এলে অসুদ-বিসুদ হবে। নানা রকমের অসুদ-বিসুদ হবে। কোন ভাবনা নাই ভাই।

সেঁজুতি – (ব্যথায় কোঁকাচ্ছে) একটু জল দে চান্দ্রেয়ী। দাদার খুব লেগেছে নারে?

বিপুল – বেশী না একটু। তো হ্যাঁ মা জননী আপনি ছিলেন তখন?

চান্দ্রেয়ী – (একটু রাগত স্বরে) কেন? না, ছিলাম না।

বিপুল – আহা, রাগেন কেন? আমি পুলিশ। আমার কাজ করতে দিন। সার্জেন্ট সাহেব এলে সব রিপোর্ট করতে হবে না?

অমিত – (কোঁকাতে কোঁকাতে) স্যার অটোর কোন দোষ নেই। ওকে ছেড়ে দিন।

বিপুল – (অমিতকে) আরে, এই তো আরেকজন ! না বাবা, আমার ধরার ক্ষমতা আছে, ছাড়বার পাওয়ার নাই। (গলা তুলে) এই অটো ওই বট গাছের নীচে লাগাও। যাও।

সৌম্য – একটু ফার্স্ট এড।

বিপুল – এই হোম গার্ড। ঐ ফার্মেসীতে যান। বলুন বিপুল গায়েন পাঠিয়েছে। তুলো ব্যান্ডেজ দেবে। নিয়ে আসুন। কুইক।

চান্দ্রেয়ী – সেঁজুতি ফুটে উঠে বসতে পারবি?

বিপুল – মা জননী একটু সহ্য করতে হবে। ফুটপাতে উঠে বসতে পারবেন? স্যার আসছেন।

অমিত – (কোঁকাতে কোঁকাতে) আমরা ঐ দোকানটার সামনে যাবো?

বিপুল – আপনার কেমন বোধ হচ্ছে স্যার? দরদ হোতা কেয়া? এই ভীড়, ক্লিয়ার, ক্লিয়ার করো।

[সড়ে যান, এখানে কি দেখার আছে, কি হোল দাদা – এরকম কথা শোনা যাচ্ছে আর তারি মাঝে সাইরেনের শব্দ, সার্জেন্ট শিবশম্ভু সান্যাল এলেন।]

শিবশম্ভু – বিপুল ভিড় হঠাও। কী হয়েছে দেখি – হুম্ – অটো কোথায় – আপনার দুজন – আর আপনারা দুজন? – বন্ধু এদের ? – বিপুল রিমুভ দেম – ফুটপাতের ঐদিকে – আমি বাইকটা ট্র্যাফিক পোস্টে রেখে আসছি - অটো ড্রাইভারকে বোলাও – আপনারা বিপুলের সাথে যাবেন।

[সড়ে যান, সড়ে যান ভাই, দেখার কিছু নাই, কি হোল দাদা কতবার বলতে হবে– এরকম কথা শোনা যাচ্ছে আর তারি মাঝে কীরে, কীরে কী হল, বলতে বলতে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর কন্ঠস্বর শোনা যাবে। আবহসঙ্গীত]

শিবশম্ভু – হুম্, তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খিচুড়ি খেতে গেলে কেন?

অমিত – (ব্যথা ততটা নেই) বৃষ্টিবাদলার দিন। বাড়ি ফিরছি। সেঁজুতি বললে দাদা খিচুড়ি খাবো। তাই।

শিবশম্ভু – তা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? পাঁচ রাস্তার মোড়। দশ রকমের গাড়ি ছুটছে।

সেঁজুতি – দোষ আমার। বললাম ফুটে ভিড়, চল দাদা রাস্তার পাশে দাঁড়াই।

শিবশম্ভু – বুদ্ধির তুলনা হয় না। দুই ভাইবোন? তাহলে কেস তো তোমাদের দুই ভাইবোনের নামেই করতে হয়! ঠিক তো? বিপুল - অটো ড্রাইভারকে ডাকো। না ডাকার দরকার নেই। ওকে বল এই চারজনকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। এরা পুরো ভাড়া দেবে।

সৌম্য – খুব বাঁচা বেঁচে গেছে। এটা ঠিক আমাদের ক্যালাসনেসের জন্য এরকম বেশী হয়।

শিবশম্ভু – থ্যাংকু স্যার এটা যে বোঝেন।

চান্দ্রেয়ী – একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করবেন না?

শিবশম্ভু – না না মনে করবার কি আছে? বলুন।

চান্দ্রেয়ী – আপনার হাইট কত? আর আপনি কি শাম্ভাজী সান্ডেল?

শিবশম্ভু – (হো হো করে হেসে) ইয়েস ম্যাম, আমি শিবশম্ভু সান্যাল – কলিগ থেকে বস্ শাম্ভাজী সান্ডেল বলে ডাকেন। আর হাইট সিক্স ফিট টু ইঞ্চেস্। কেন বলুন তো?

চান্দ্রেয়ী – আমার বন্ধুর স্কুলে ট্র্যাফিক ডিসিপ্লিন নিয়ে বলতে একজন অফিসার থানা থেকে গিয়েছিলেন।

শিবশম্ভু – হ্যাঁ, আমরা ওরকম অ্যাওয়ারনেস্ ক্যাম্পেন করছি। আমার ডিউটির মধ্যে ওটা।

সৌম্য – আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আসবেন না? আমরা আমাদের ইউনিয়ন থেকে অ্যারেঞ্জ করতে পারি?

শিবশম্ভু – অবশ্যই যেতে পারি। যে ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খিচুড়ি খাও, কানে ঠুলি লাগিয়ে রাস্তা বা ট্রেন লাইনের পাশ দিয়ে মগ্ন হয়ে হাঁটো, আমাদের যাওয়া উচিৎ। ট্র্যাফিক গার্ড অফিসে লিখিত প্রস্তাব দিও। তবে একটু ভয় আছে আমাদের।

চান্দ্রেয়ী – কেন, কেন ?

শিবশম্ভু – যদি স্লোগান দাও শিক্ষাঙ্গনে পুলুশ কেন জবাব দাও। কলরব, হোক কলরব ! তখন কী হবে?

[না, না, এমা না না, মিলিত স্বর হাসিসহ। পর্ব শেষের আবহসঙ্গীত]

পর্ব – দুই

[ত্রিদিব সেনের ফ্ল্যাট, ডোর বেল বাজবে, অমিত দরজা খুলবে, ত্রিদিব ও শিবশম্ভু দাঁড়িয়ে]

ত্রিদিব – আসুন সান্যাল সাহেব। এই আমার পুত্র, অমিত। অমিত ইনি –

অমিত – হোয়াট এ সারপ্রাইজ। আসুন, আসুন। বাবা উনি আমার পরিচিত। সান্ডেল সাহেব!

ত্রিদিব – স্যান্ডেল সাহেব! স্যান্ডেল আবার কারো নাম হয় না কি?

শিবশম্ভু – হয় হয়, ভেতরে চলুন, বলছি।

ত্রিদিব – হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন, বসুন। অমিত তোর মা কি ফোন করেছে? ফ্লাইট ডিলেইড শুনলাম?

অমিত – দশটার আগে ল্যান্ড করবে বলে মনে হয় না। ছোটমামা এয়ারপোর্টে যাবে।

ত্রিদিব – ওর মা, দাদার বাড়ি মুম্বাই গিয়েছে। আজ ফিরবে। অমিত সেঁজুতিকে চা দিতে বল।

শিবশম্ভু – যা বলছিলাম সেন সাহেব। আপনার এই পুত্র এবং আপনার কন্যা, আমার পূর্ব পরিচিত।

অমিত – বাবা তোমাকে সেই খিচুড়ি খাবার কথা -

ত্রিদিব – (একটু হাসি মিশিয়ে) ও-ও এবার বুঝলাম। আপনি সেই শাম্ভাজী সান্ডেল। তাই বলুন।

শিবশম্ভু – সেন সাহেব আপনার কত দিন এখানে?

ত্রিদিব – (বেশ গর্বের সাথে) আমরা মশাই সেই প্রথম থেকে। রাস্তা ছিল না, জলের ব্যবস্থা ছিল না। থাকার মধ্যে কোটি কোটি মশা। শখানেক সাপ।

শিবশম্ভু – বলেন কি! তারপর?

ত্রিদিব – তারপর এই তিরিশ বছরে দুতিনশ বাড়ি হল, রাস্তা জল আলো হল।

সেঁজুতি – (চা নিয়ে আসবে) স্যার নমস্কার ভালো আছেন? চিনতে পারছেন?

শিবশম্ভু – নমস্কার। খিচুড়ি-খাব-দাদা-রাস্তাতে-দাঁড়িয়ে? চিনতে পারব না কেন? হাত সেরেছে?

সেঁজুতি – অনেকটাই। ফিজিওথেরাপি চলছে। তা বাবার সাথে -

শিবশম্ভু – আমাদের কোয়ার্টার রেনোভেট হচ্ছে। কাছেই কাস্টমসের কিছু কোয়ার্টার আমরা লীজ নিয়েছি। বছর দুই থাকব মনে হয়। সেন সাহেবের সাথে মর্নিং ওয়াক-গ্রুপে আলাপ। ধরে আনলেন আজ।

অমিত – বাবা ধরে আনলেন শাম্ভাজী সান্ডেলকে! বিশ্বাস হয় না কাকু।

[সবাই হেসে উঠবে]

ত্রিদিব – বিশ্বাস হবে না কেন? তোমরা আইন-টাইন মানো না তোমরা ভয় পাবে। আমর ল এবাইডিং সিটিজেন। আমরা ভয় পাবো কেন? বলুন সান্যাল সাহেব। ঠিক কি না?

শিবশম্ভু – পারফেক্ট। তবে আপনার ঐ গাছ কাটা নিয়ে আমার কিছু বলার আছে।

ত্রিদিব – সে থাকতেই পারে। বলুন আপনার কি বলবার আছে।

অমিত – গাছ কাটা? সে আবার কি?

ত্রিদিব – ইয়েস গাছ কাটা। কি এক রাস্তা চওড়া হচ্ছে। তো তেনারা মনের সুখে সব গাছ কাটছেন। কেন, হোয়াই?

অমিত – দরকার তাই কাটছে। দরকারটা ঠিক কি তা হয়তো আমরা জানিনা।

শিবশম্ভু – সেন সাহেব আপনি বলছিলেন এই বাড়ি আপনার একতলা ছিল। আপনারা ছিলেন দুটি মানুষ। আজ প্রোমোটারের হাতে সেই একই বাড়ি পাঁচতলা। আপনার ফ্যামিলিতে লোক এখন চারজন। সব ফ্ল্যাট মিলে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন মানুষ।

ত্রিদিব – কারেক্ট। এই সোসাইটিতে খুব বেশী হলে লোক ছিল এক হাজার। এখন পাঁচ হাজারের বেশি ছাড়া কম হবে না। (গর্বের সাথে) ওয়ান অফ দা বেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট হাউজিং সোসাইটি স্যার।

শিবশম্ভু – এই যে বেস্ট হাউজিং সোসাইটির লোকসংখ্যা বাড়ল তো তাঁদের জন্য রাস্তাঘাট, জল, আলো সব বাড়াতে হল। এই যে আপনাদের ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস এর ইতিহাস জানেন কি?

অমিত – এরও ইতিহাস আছে? কি রকম?

শিবশম্ভু – সবার ইতিহাস আছে অমিতচন্দ্র। ১৯৬১ কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ থেকে একটু বেশী। সেটা ২০১১ সালে বেড়ে হল ৪৫ লক্ষর মতো। কলকাতা ২০১৭ সালে ১৪৬ লক্ষ, মুম্বাই ১৮৪, দিল্লি ১৮৮ আর চেন্নাই ৭১ লক্ষ। অবশ্য ফোরকাস্ট এগুলো।

ত্রিদিব – বলেন কি? এই পপুলেশন প্রেসার নেবার মতো –

শিবশম্ভু– এই প্রেসার নেবার জন্য শহরকে তৈরি হতে হয়। টাউন প্ল্যানার বলেন যে, শহর নদীর পাড়ে হলে সেই নদীর পাড় ধরে বড় হবে। কলকাতা হুগলী নদীর পাড়ে। পশ্চিমে হুগলী নদী। ফলে, কলকাতা পশ্চিমে বাড়ে নি। বেড়েছে উত্তর ও দক্ষিণে। পুবে জলাভূমি, সেদিকেও যেতে পারে নি, অন্তত প্রথম দিকে।

ত্রিদিব – ঠিক। এই সোসাইটি নিয়েও প্রথমে অসুবিধে ছিল।

শিবশম্ভু – আরেকটা অসুবিধে বলি। কলকাতার দক্ষিণ থেকে উত্তরে রাস্তা বলতে তো সুবোধ মল্লিক রোড থেকে গড়িয়াহাট টু এপিসি রায় রোড। তারপর শরৎ বোস রোড থেকে এজেসি বোস রোড হয়ে এপিসি রায় রোড। তিন নম্বর টালিগঞ্জের বীরেন শাসমল রোড থেকে শুরু হয়ে শ্যামাপ্রসাদ, আশুতোষ মুখার্জী চৌরঙ্গী রোড, তারপর হয় চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ নয় তো কলেজ স্ট্রীট ধরে শ্যামবাজার। আরেকটা হুগলী নদীর পাড় বরাবর শ্যামবাজার। মোটামুটি এইতো রাস্তা।

সেঁজুতি – তাই কি এই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান -

শিবশম্ভু – পাক্কা ম্যাডাম। উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াতের সুবিধের এবং ঐ রাস্তাগুলোর ওপর চাপ কমাতে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস। একুশ কিলোমিটার রাস্তা উত্তরে বিধাননগরকে জুড়েছে দক্ষিণে রাজপুর-সোনারপুরের সাথে। মোট এগারোটি কানেকটর যেমন, বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলী, গড়িয়াহাট-কসবা, পার্ক সার্কাস-সায়েন্স সিটি, এরকম হবার ফলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বা আরও উত্তরে যাবার সুবিধে হয়েছে। তবে অসুবিধে একটা হল।

সেঁজুতি – কি অসুবিধে কাকু?

শিবশম্ভু – (মজা করে) চা ম্যাডাম। চা ছাড়া সুবিধে হচ্ছে না আর।

ত্রিদিব – কী কান্ড! সেঁজুতি মা, থাপা সাহেবের দেওয়া চা দিয়ে বানাও। আমিও খাব।

শিবশম্ভু – থাপা সাহেব? এনিথিং স্পেশাল?

ত্রিদিব – আরে তেমন কিছু না। পুরনো কলিগ থাপা সাহেবের সাথে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে দেখা গত বছর। ঠিক চিনতে পেরেছেন। জোর করে দুটো চায়ের প্যাকেট গিফট দিলেন।

শিবশম্ভু – শহর বাড়ছে। যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে বেআইনি কাজ। সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম স্যার। কারো কাছে ঘুষ খাইনা বটে, তবে কারো সুখও খাই না, বদমাইশি করলে স্রেফ পিটিয়ে দিই। ব্যস্।

অমিত – কাকু, আমরাও সেদিন ভেবেছিলাম আপনি চালান করে দেবেন আমাদের! নিন চা এসে গেছে।

[চায়ের ফ্লাস্কসহ সেঁজুতি এল]

সেঁজুতি – ইস্ চালান দিলেই হল? এমন চা বানিয়ে কে খাওয়াবে শুনি?

শিবশম্ভু – বস্ যদি শোনেন চায়ের লোভে চালান দিই নি অবশ্যই চাকরি যাবে আমার! তবে সেন সাহেব সেদিন বিপুলের মেসেজ পেয়ে আমার ইনিশিয়াল রিএ্যাকশন ছিল ফেটাল কিছু হয় নি তো! (চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে) আঃ। ফার্স্ট ক্লাস।

সেঁজুতি – ভালো হয়েছে কাকু?

অমিত – ভালো বলুন কাকু, তা-না-হলে আর জুটবে না কিন্তু!

সেঁজুতি – (নাঁকি সুরে) দাদা ভালো হচ্ছে না। বাবা তুমি কিছু –

ত্রিদিব – এরকম সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে, আর তোমরা – এই অমিত, কি হচ্ছে?

শিবশম্ভু – ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমরা জে-এন-এন-ইয়ু-আর-এম এই লেখা বাসের গায়ে দেখেছ কখনো?

ত্রিদিব – যারা দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় খিচুড়ি খেতে খেতে অটোর ধাক্কা খায় তারা কী দেখবে বলুন? আমি বলছি, জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন প্রোগ্রাম?

[সেঁজুতি ও অমিত অপ্রস্তুত হয়ে বাবা, বাবা যে কী বলে, বলবে]

শিবশম্ভু – ইয়েস স্যার। তো ঐ মিশন প্রোগ্রামে মেট্রোপলিটান বাইপাসকে চার লেনের রাস্তা থেকে আট লেনের রাস্তার কাজ চলছে। অবশ্যই খুব ধীরে ধীরে সেটা মানতে হবে।

সেঁজুতি – ধীরে মানে? কাজ হচ্ছে তাই বোঝা যায় না। আর কাজ মানে তো দুপাশের নয়ানজুলি বুজিয়ে ফেলা!

শিবশম্ভু – হ্যাঁ নয়ানজুলি নিয়ে পরিবেশবিদরা প্রতিবাদ করছেন। তো এই বাইপাসের ওপর পরমা আইল্যান্ড থেকে পার্ক সার্কাস অব্দি উড়াল পুল হবার ফলে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আলিপুর পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে, যা বিশ-ত্রিশ বছর আগে কল্পনাও করা যেত না।

ত্রিদিব – আর এই যে প্রায় পনেরো-বিশ কিলোমিটার রাস্তার গাছগুলো কেটে মরুভূমি বানিয়ে দিল?

শিবশম্ভু – মরুভূমি অবশ্যই থাকবে না। ফাস্ট গ্রোয়িং ট্রি লাগিয়ে সবুজ করতে হবে, নইলে কপালে দুঃখ আছে।

অমিত – আজকের দুঃখ, কালকের আনন্দ এমন সব স্লোগান লেখা দেখি কাকু। অথচ দেখুন গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার কেমন ফটাফট উঠে গেল।

সেঁজুতি – কাজের ইচ্ছেটাই যেন আমাদের মধ্য থেকে উবে গেছে তাই না? যে ডেটার ওপর ভরসা করে আজ আমি রাস্তার প্ল্যান করছি, টাইম ওভার রানের ফলে কেবল খরচ বাড়ল তাই নয়, ইউটিলিটিতেও অনেক ফারাক হয়ে যাবে। তাই না কাকু?

ত্রিদিব – আপনি মহাশয় চাকরি সামলে এত খোঁজ খবর রাখেন এটা আমাকে অবাক করে দিচ্ছে। আবার এমন সব খবর যা আপনার না জানলেও চলে!

শিবশম্ভু – বরং উল্টো। শহরের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, তার ওঠাপড়া, এগোনো-পিছোনো জানা আমার কাজের মধ্যে। কিছুক্ষণ আগে আমরা পপুলেশন প্রেসারের কথা বলছিলাম। কোলকাতায় যে ভাবে জনসংখ্যা বেড়েছে বা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কেন?

অমিত – রাজ্য মানে তো কোলকাতা শহর নয়, বরং গ্রাম, কারণ বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে থাকেন। এই গ্রামে যদি ভাতের অভাব হয় - হবেই, যদি না গ্রামে কাজ তৈরি হয় - তবে সেখান থেকে মানুষ মাইগ্রেট করবে। কোলকাতায় আসবে, না হলে অন্যত্র কাজের জন্য যাবে।

শিবশম্ভু – তাহলে কোলকাতার বা শহরের পরিকাঠামো সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে। রাস্তাঘাট, জল, বিদ্যুৎ, যাতায়াতের ব্যবস্থা সব কিছু বাড়বে?

অমিত – নিশ্চয় কাকু আমি জানি কোলকাতা এনভিরনমেনটাল ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টের কাজ শুরু গত নব্বই দশকে।

ত্রিদিব – জানি, জানি। মূলত শহরের নিকাশী ব্যবস্থা, বস্তির উন্নতি, শহরের আবর্জনা পরিষ্কার, খালগুলো থেকে দখলদার সরানো এসব কাজ করবার কথা।

শিবশম্ভু – অনেক রাস্তা এই প্রজেক্টের জন্য কিছুটা চওড়া হয়ে গেছে। মোট জনসংখ্যার নিরিখে কলকাতার রাস্তা ২০০৪ সালে ছিল মাত্র ৬%, সেখানে মুম্বাইতে ১৭%, দিল্লীতে ২৩%। এর ওপরে যাদবপুর, গার্ডেনরীচ

আর বেহালা এই তিনটি মিউনিসিপ্যাল এরিয়া কোলকাতা কর্পোরেশনের মধ্যে এসেছে। ফলে রাস্তা যেমন বেড়েছে, তেমনি হ্যাপা বেড়েছে ট্রাফিকের।

সেঁজুতি – কোলকাতার ট্রাফিক মুভমেন্ট ইজি করবার জন্য কাকু উড়াল পুল, মেট্রো রেলের সংযোগ আরও বাড়িয়ে সল্ট লেক থেকে হাওড়া যাবার জন্য ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ চলছে।

অমিত –ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো হুগলী নদীর প্রায় তিরিশ মিটার নীচে দুটো টানেলের মধ্য দিয়ে যাবে। পাঁচশ মিটার মত লম্বা হবে টানেল। সতের কিলোমিটার রেল রাস্তার ছয় কিলোমিটার উঁচু করিডর দিয়ে আর এগারো কিলোমিটার মত মাটির নিচু দিয়ে যাবে।

শিবশম্ভু –কোলকাতা শহরের ট্রান্সপোর্ট পরিকাঠামোতে এটা খুব বড় কাজ। এটা ভাই মানতে হবে। এছাড়াও রেল পরিবারে আরেক শিশুর জন্ম সম্ভাবনা। বাসযোগ্য করে যেতে হবে সেই শিশুর জন্য -

সেঁজুতি –আরে ব্বাস্! আমাদের শাম্ভাজীকাকু তো শায়ের নিকলা। শিশুর জন্ম সম্ভাবনা! মনোরেল তো? মুম্বাইতে কুড়ি কিলোমিটার রাস্তা এই তো বছর তিনেক আগে চেম্বুর-ওয়াডলা-জেকব সার্কেল রুটে দৌড় সুরু করেছে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে? সে তো বিশ হাত জলের নীচে কাকু!

শিবশম্ভু – এটা ঠিক দু'হাজার চারের ভাবনার চিন্তার ফল এখনো সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। শুনেছিলাম বজবজ থেকে তারাতলা এই রুটে প্রথম মনোরেল যাবে।

সেঁজুতি –ভাববেন না কাকু সে তো চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, দিল্লি অনেকের নামই শুনেছিলাম। দেখা যাক।

ত্রিদিব - তবে সান্যাল সাহেব উল্টোডাঙ্গা থেকে প্রিন্সেপ ঘাট পর্যন্ত দৌড়চ্ছে চক্ররেল। তা কেবল উত্তর কলকাতার নয় আরও উত্তরের রানাঘাট বা বনগাঁ থেকে যাত্রী, যারা কলকাতা শহরের বিবাদী বাগ-বড়বাজার অঞ্চলে কাজে আসছেন, তাঁদের আর শেয়ালদাতে না নিয়ে অনেক সহজেই কাজের জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে।

সেঁজুতি –বাবা, এটা খেয়াল করেছ যে পুরো দক্ষিণের ও উত্তরের □□□□□□□ নিউ গড়িয়া বা দমদম থেকে পাতাল রেলে সহজেই উত্তরে বা দক্ষিণে কাজে চলে যেতে পারছেন। ফলে ওপরে রাস্তায় যাত্রী চাপ এবং শেয়ালদা স্টেশনে যাত্রী চাপ অনেক কমেছে।

শিবশম্ভু – একটা কথা সেঁজুতি। উন্নয়নের সুরু তো সভ্যতার সুরু থেকে। অনেকেই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে প্রাকৃতিক সম্পদ বেপরোয়া ব্যবহার করে। কৃষিজমি, জল, বাতাস, সব জায়গায় টান পড়েছে। ঠিক এই সময় একটা নতুন প্রশ্ন। অন্য ধরণের উন্নয়নের যা পরিবেশের সাথে যুক্ত। উন্নয়নের সাথে পরিবেশের সামঞ্জস্য। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট শব্দটি এলো। এর প্রতিশব্দ আমরা সুস্থায়ী বা টেঁকসই উন্নয়ন বলতে পারি।

সেঁজুতি - কাকু, এই টেঁকসই উন্নয়নের কিছু লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নতি তখনই হাসিল হবে যখন ঐ মাপকাঠি নিশ্চিত করা যাবে, তাইতো?

শিবশম্ভু – ঠিক। কোলকাতার বা শহরের পরিকাঠামো সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে বলছিলাম না, সেই সূত্রেই বলব রাস্তার উন্নতি করা দরকার, রাস্তা বাড়ানো দরকার যাতে যানবাহনের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াবার সুযোগ তৈরি হয়। এবং তা যেন পরিবেশের প্রতিকূল না হয়।

ত্রিদিব – শতকরা একশ বার সত্যি সেকথা। পরিবেশ। তার ওপর আমাদের আরেক ঝামেলা হুগলী নদী।

সেঁজুতি - হুগলী নদী? সে বেচারী আবার কি করল তোমার বাবা?

ত্রিদিব – না, না। ইনি থাকাতে আমাদের বহু উপকার, বেনিফিট। তবে আমরা থাকি পুবে। আমাদের উত্তর, পশ্চিম আর দক্ষিণ ভারতে যেতে হলেই এই হুগলী নদী পার হও।

সেঁজুতি – তাই তো বিদ্যাসাগর সেতু, নিবেদিতা সেতু, হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু, বিবেকানন্দ ব্রিজ। তবে দশ বিশ বছর পরে আরও ব্রিজ লাগবে, তা বলতে পারো।

[ঘড়িতে দশটা বাজার শব্দ হবে। ব্যস্ত হয়ে শিবশম্ভু বলবেন]

শিবশম্ভু – মাই গড, দশটা বেজে গেল! এবার উঠতে হবে। ইজাজৎ দিজিয়ে সেন সাব। অব চলে।

সেঁজুতি – না। না। ঠিক আছে আবার কবে আসবেন কাকু? বলুন। কথা দিন।

অমিত – তুই একটু থামবি সেঁজুতি? আচ্ছা কাকু মার্বেল পাথরের গোডাউনের কাছে যে কাস্টমসের কমপ্লেক্স সেখানেই কি আপনাদের –

শিবশম্ভু – একেবারে ঠিক। ঢুকেই ডানদিকে ফার্স্ট ব্লকের ফার্স্ট ফ্লোরের ফ্ল্যাট ওয়ান।

অমিত – আমি শিওর ঐ কমপ্লেক্সে সৌম্য আর চান্দ্রেয়ী থাকে। সৌম্যর বাবা আর চান্দ্রেয়ীর দাদাও কাস্টমসের অফিসার।

শিবশম্ভু – হতে পারে। ইনফরম্ করে চারজনেই একদিন চলে এসো। আলোচনাটা এগিয়ে নেওয়া যাবে।

অমিত – দেন লেট ইট বি লাইক দিস। আজকের আলোচনা ওদের আমি ব্রীফ করে আপনার সুবিধেমত আপনার ওখানে চলে যাব।

শিবশম্ভু – ডান্।

ত্রিদিব – বা মশাই বা! আমি বাদ! এটা একটা সুবিচার হল!

[সবাই হেসে উঠল। আবহসঙ্গীত]

পর্ব – তিন

[কাস্টমস অফিসার কমপ্লেক্স। সৌম্য, চান্দ্রেয়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে কমপ্লেক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে।]

সৌম্য – (নিচু স্বরে) এক মিনিট। চান্দ্রেয়ী, অমিত ঠিক বলেছে ঠিকানা। ঐ দেখ স্যান্ডেল সাহেব। ডানদিকে তাকা।

চান্দ্রেয়ী - (নিচু স্বরে) অনেক আগে দেখেছি। অমিতরা এলে একসাথে ঢুকব। দেখতে পেয়েছি বুঝতে দিস না।

শিবশম্ভু – (একটু উঁচু স্বরে) এই যে স্যার এদিকে, আপনাদের বলছি। অমিতরা এসে গেছে। আপনারাও আসুন।

সৌম্য – (একটু উঁচু স্বরে) আসছি আমরা। (নিচু স্বরে) একটা ষ্টুপিড অমিত। আমাদের বলল দাঁড়াতে, আর নিজেরা এসে বসে আছে!

[একটু পটপরিবর্তনের আবহসঙ্গীত]

শিবশম্ভু– আসুন, আসুন ভেতরে আসুন।

চান্দ্রেয়ী – সেঁজুতি তোরা বললি দাঁড়াতে। আবার নিজেরা এসে বসে আছিস!

অমিত – মোবাইলে কটা মিস কল আছে দেখ আগে।

শিবশম্ভু– আমি বলি। ব্যালকনি থেকে দেখলাম অমিতরা দুজন মোবাইলের করসত করেই যাচ্ছে। আমিই ডেকে নিলাম। তারপর ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই - তো তোমাদেরও ডেকে নিলাম। ক্লিয়ার? এবার হোক কলরব!

সৌম্য – তাই বলুন। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে অমিত আপনাদের পুরো আলোচনা রিক্যাপিচুলেট করেছে। আমরা তারপর থেকেই খুব এক্সাইটেড বাকিটার জন্য।

চান্দ্রেয়ী – আমি বাড়ি ফিরে বৌদিকে বলছিলাম, তখন দাদাও বসে ছিল। সব শুনে দাদা বলল কি, বাব্বা সার্জেন্ট সাহেব তো খুব পড়াশোনা করা লোক মনে হচ্ছে।

সেঁজুতি– আরে বাবাও তো একেবারে মুগ্ধ। বলে, সারাজীবন কে ট্যাক্স দিল না, তাই খুঁজলাম। কার কাছ থেকে আরও ট্যাক্স আদায় করা যায় সেই ফন্দি আঁটলাম। অথচ সান্যাল সাহেব নিজের কাজ করেও কেমন কত খবর রাখেন।

[শিবশম্ভু দুহাতে মাথা টিপে ধরে বসে আছেন দেখে আমিত]

অমিত – কাকু। মাথা টিপে ধরে বসে আছেন কেন! এনিথিং রং?

শিবশম্ভু– না, না, সে রকম কিছু না। কেবল ভাবছি গরীবের চাকরিটা না চলে যায়।

[সবাই একসাথে বলে, কেন কাকু কেন?]

শিবশম্ভু– আমার বস্ যদি বাবা-দাদাদের কাছ থেকে বা হোক কলরবদের কাছে আমার এসব বক্তৃতার কথা শোনেন তাহলে প্রীত না-ই হতে পারেন –

[সবাই একসাথে হই হই করে ওঠে]

চান্দ্রেয়ী – আপনার বসের নামটা বলুন তো। একবার শুনি নামটা। একটা ডেপুটেশন নিয়ে যাই সবাই!

শিবশম্ভু– (হেসে) না, না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তা তোমরা পারো। (গলা উঁচু করে) কাঞ্চা চা দিয়ে যা।

সেঁজুতি– কাঞ্চা! নেপালী? নেপালী মুক্তি মোর্চা?

শিবশম্ভু– মা নেপালী, বাবা বাঙ্গালী। সার্কুলার রেলের কাজ তখন শেষের দিকে। একটা পুলিশ অপারেশনে দুজনেই মারা যায়। ওর বাবা হাসপাতালে হাত ধরে বলল, স্যার দুজনকেই মারলেন। কাঞ্চাকে কে দেখবে? সেই থেকে কাঞ্চা আমার কাছে। আমার কম্বাইন্ড হ্যান্ড।

[সবাই চুপ। কাঞ্চা, চা আর পাঁপড় ভাজা রেখে গেল। কোন সংলাপ নেই।]

শিবশম্ভু– আরেকটা গুণ আছে কাঞ্চার। হি ইজ এ শার্প শুটার। রাইফেল এন্ড রিভলবার বোথ। আমি ব্যবস্থা করেছি। (অস্ফুট শব্দ 'রিয়েলি, মাই গড') চায়ের সাথে টা এসেছে। এসো এগুলোর সদ্গতি করা যাক। তো আজ ওই সার্কুলার রেল বা রেল দিয়েই সুরু হোক। কেমন?

অমিত – এটা ঠিক যে কোন বড় শহরে যাতায়াতে রেলের একটা খুব বড় ভূমিকা থাকে। কোলকাতায় কেন ভারতের সব বড় বড় শহরেই আছে।

সৌম্য – কোলকাতায় লোকাল ট্রেন, সার্কুলার ট্রেন, পাতাল বা মেট্রো রেল, আপাতত এই তিন রেলের মুখ দেখি।

শিবশম্ভু– আরেক জনকে কিন্তু ভুলো না। সে আমাদের টেরাম বা ট্রাম। কার্জন সাহেবের স্বপ্নের ট্রাম একমাত্র কোলকাতা শহরেই চলে।

সৌম্য – আমরা বিশেষ কিছুই জানিনা এঁনার বিষয়ে কাকু।

শিবশম্ভু– এঁনার যাত্রা সুরু তার আঠারশ তিয়াত্তরে। প্রথম ঘোড়াতে টানা হত ট্রাম। উনিশ শতকে ইলেক্ট্রিক ট্রাম। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ট্রাম কোম্পানি জাতীয়করণ করা হয়।

অমিত – শুনেছি যখন লোক সংখ্যা বাড়ল অভিযোগ উঠল ট্রাম ,অন্যান্য যানবাহনের গতি কমিয়ে দেয়। রবীন্দ্র সেতু ট্রামের ভার বইতে পারছে না। বন্ধ করে দেওয়া হল ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রামের যাওয়া-আসা।

শিবশম্ভু– ঠিক। কোলকাতার নানান রাস্তা মেট্রো রেলের কাজের ,উড়াল পুল ,জন্য নানান সময় কোন না কোন ট্রামের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হতে থাকে। সেই রাস্তায় ট্রাম আর চলতে দেওয়া হয় নি। টিম টিম করে চলছে। ট্রাম কোম্পানির বাস চালানর চেষ্টা সফল হয় নি।

অমিত – এখন তো ট্রাম ডিপোর জমি বিক্রি করবার কাজ চলছে। এই সেদিন টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো বন্ধ হয়ে গেল।

চান্দ্রেয়ী – আচ্ছা, কোলকাতায় হুগলী নদীতে ফেরী জলপথ খুব উপকারে আসছে। তাই না?

শিবশম্ভু – ইয়েস ম্যাম। কোলকাতা আর হাওড়াকে যমজ শহর বলা হয়। এই যমজ দুটিকে ফেয়ারলি ঘাট, প্রিন্সেপ ঘাট, শিবপুর ঘাট, হাওড়া ঘাট, বেলুড় ঘাট ইত্যাদিকে লঞ্চ সার্ভিস দিয়ে যুক্ত করে কেবল যে রাস্তার ওপর থেকে অনেক চাপ কমানো গিয়েছে তাই নয়, দূষণের বিচারেও অনেক লাভ হয়েছে।

অমিত – শুনেছি বেলেঘাটা-লেক টাউন-কেস্টপুর খাল দিয়ে জল পরিবহনের কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেটাও ভাবা হচ্ছে শুনেছি।

শিবশম্ভু – আমরা যদি গোটা ভারতের শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার ছবিটা দেখি তাহলে দেখব যে সাধারণ মানুষের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থাতে প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ প্যাসেঞ্জার বাস ব্যবহার করেন।

সেঁজুতি – তাই? তবে সব দেশের সব মানুষ একটি ব্যাপারে একমত। যানবাহন ব্যবস্থার দায় দায়িত্ব সে দেশের সরকারের।

শিবশম্ভু – হ্যাঁ তাই। কারণ ভারতে বেশীর ভাগ শহর এখনো রেল ব্যবস্থার সাথে যুক্ত নয়। ফলে বাস, মিনিবাস, অটো রিক্সা, সাইকেল রিক্সা, ট্যাক্সির ওপর যাত্রীরা নির্ভরশীল। বড় বড় শহরের চেহারাটা কাছাকাছি।

সৌম্য – আমাদের ইলেকট্রিকের ব্যবহার যানবাহনে বাড়ানো উচিৎ। ফসিল ফুয়েল পরিবেশ নস্ট করছে।

শিবশম্ভু – কলকাতা মেট্রো ১৯৮৪ সালে চালু হয়। মেট্রো রেল এখন আছে কোলকাতা, চেন্নাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, গুরুগ্রাম, মুম্বাই, জয়পুর আর হায়দ্রাবাদে।

সৌম্য – কিন্তু শুনেছি ন্যাশনাল আরবান ট্রান্সপোর্ট পলিসি অনুসারে যে যে শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষের বেশী এরকম পঞ্চাশটি শহরে মেট্রো রেল চালু হবে?

শিবশম্ভু – ঠিকই শুনেছ। **কাজ চলছে বা পরিকল্পনা স্তরে কোচি, নবী মুম্বাই, ও আরও প্রায় কুড়ি-একুশটা শহরে।**

অমিত – যাই বলুন, মেট্রো রেল ইলেকট্রিকে চলে বলে পরিবেশবান্ধব। অন্তত ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার থেকে বাঁচোয়া। তাই না?

সেঁজুতি – কে বাঁচোয়া, আর কতটা বাঁচোয়া সেটা ভাব দাদা। ইলেকট্রিকে চলে বললেই হোল না, ইলেকট্রিকে চলতে গেলে তোর ডেডিকেটেড ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা থার্মাল না হাইডেল নাকি নিউক্লিয়ার এনার্জি হবে?

অমিত – তা ঠিক, সেখানেও বহু প্রশ্ন। একটা অ্যান্টি-নিউক্লিয়ার এনার্জি লবি আছে এবং সঠিক কারনেই আছে। আপনি কি বলেন কাকু?

শিবশম্ভু – এই কারনেই অপ্রচলিত শক্তির কথা সবাইকে ভাবতে হবে বা হচ্ছে। কোচিতে তো গোটা এয়ারপোর্ট সৌরশক্তিতে এখন বলীয়ান শুনছি।

সেঁজুতি – তখন স্কুলে পড়ি। দাদাদের সাথে বহরমপুর গেছি। ওমা, দেখি টোটো নামে এক ধরনের রিক্সা টো টো করে শহরে ঘুরছে। মামার ছেলে, আমারই বয়েসী, বলল, হু হু বাবা মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের গিফট টু দা নেশন। ওখানেই নাকি প্রথম তৈরি হয়ে পথে নেমেছে।

শিবশম্ভু – টোটো এখন প্রায় সব জেলা শহরে টো টো করে ঘুরছে। কোথাও অটো বা কোথাও সাইকেল রিক্সা আবার কোথাও মিনি বাসের সাথে ঝগড়া করে চালাচ্ছে। কোলকাতা শহরে চালাবার এ্যাপ্রুভাল নেই। খুব পলিউশন করে বলেও মনে হয় না।

সৌম্য – শর্ট ডিস্ট্যান্স কভার করতে এগুলো কোলকাতায় চালানো যায় না কাকু?

শিবশম্ভু – সাইকেল রিক্সা আর অটো লবি বাধা দেবে। আর ভাবার কথা যাঁদের তাঁরা কি ভাবছেন সেটাই আসল। তবে কোলকাতা শহরে চালাবার এ্যাপ্রুভাল নেই এমন একজন আছেন। তিনি খুব ভোরে আসেন আর কাজ করেই পালিয়ে যান। দেখেছ তারে?

সৌম্য – খুব ভোরে আসেন? না, দেখেনি তো?

শিবশম্ভু – গড়িয়ার দিকে একদিন - যাকে তোমরা বল ছাপা-মারা ডিউটি - তাই করে ভোরবেলা ফিরছি। গাঙ্গুলিবাগানে দাঁড়িয়েছি একটু চা খাব। ড্রাইভার সাহেব গাড়ী পার্ক করে চা আনতে গিয়েছেন। হঠাৎ শুনি ভট্ ভট্, ভট্ ভট্। নতুন শব্দ কানে লাগল।

সেঁজুতি – কী সেনসিটিভ কান রে বাবা!

শিবশম্ভু – তোমাদেরও হোতো, যদি কানে অহোরাত্র মোবাইলের প্লাগ গুঁজে না রাখতে।

সেঁজুতি – (একটু মুখ বাঁকিয়ে) ইস্, বলেছে আপনাকে!

শিবশম্ভু – তো দেখি পাহাড় প্রমান সবজি ডাই করা তিন-চার জন মানুষসহ এক বিচিত্র ভ্যান। পেছনে বসা ফোর্সকে বললাম পাকড়ো আভি। পাকড়ে যা বুঝলাম পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন কারো কোনও লাইসেন্সের বালাই নেই।

সেঁজুতি – তার মানে? চলছে কিভাবে?

শিবশম্ভু – জাস্ট সাইকেল ভ্যানে একটা মোটর বাইকের এঞ্জিন লাগিয়ে নতুন বাজার, রাজপুর হাট থেকে যাদবপুর বাজার অব্দি যায়। ম্যাটাডর বা হাতি করে আনলে খরচ অনেক বেশী। নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন, বুঝলে ম্যাডাম?

[কাঞ্চা এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে শিবশম্ভু বলবেন]

শিবশম্ভু – কাঞ্চা, বাতি জ্বালা। আর চা-টা যা দেবার দে। (আর সবাইকে বলবে) কাঞ্চা নেপালী মায়ের কাছে নাকি ছোটবেলাতে মোমো বানাতে শিখেছে। তোমাদের জন্য বানিয়েছে। চলবে তো?

সেঁজুতি – চলবে মানে? কাকু আমাদের খিচুড়িও চলে, মোমোও চলে। মোদের সব চলে! মোরা খুব ভালো কাকু!

চান্দ্রেয়ী – তুই মোমোর স্বপ্ন দেখ সেঁজুতি, আপনি আমাদের অটলজির সময় যে বিশাল রোড প্রজেক্ট হয়েছিল সেটার কথা বলুন প্লিজ।

অমিত – কাকু আই ক্যান এক্সপ্লেন দ্যাট। শুড় আই? থাঙ্কু ইউ কাকু। (খুব তাড়াতাড়ি বলবে) গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল হাইওয়ে প্রায় ছহাজার কিলোমিটার ছয় লেনের রাস্তা। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই ছাড়াও বেঙ্গালুরু, জয়পুর, পুনে, সুরাট, ও আরও কয়েকটি শহর এই হাইওয়ে প্রকল্পে যুক্ত।

শিবশম্ভু – ফ্রাঙ্কলি এতো ডিটেলসে আমিও জানতাম না। আসলে যে কোন শহরের যানবাহন ব্যবস্থায় দেখা উচিৎ ব্যবস্থা কতটা পরিবেশ বান্ধব এবং কতটা নিরাপদ। এরপরেই গতি ও ব্যয়। কত দ্রুত গতিতে গন্তব্যে পৌঁছুনো যাবে ও যাত্রীকে ব্যয়ভার কী মাত্রাতে বহন করতে হবে।

অমিত – আমি তো জয়পুরে উটে টানা গরুর গাড়ি –

সেঁজুতি – তুই কীরে দাদা? হয় গরুর গাড়ি নয় উটে টানা গাড়ি!

[সবাই হেসে উঠবে]

অমিত – (অপ্রস্তুত হয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই হোল আর কি!

শিবশম্ভু – মাস দুই হোল মুম্বাই-আমেদাবাদ রুটে ভারতে প্রথম সবচাইতে দ্রুতগতি ট্রেনের জন্য কাজ শুরু হয়েছে। ট্রেনের স্পীড হবে ঘন্টায় ছশ পঞ্চাশ কিলোমিটার।

সেঁজুতি – ঊরে বাবা! ঘন্টায় ছ-শ প-ঞ্চা-শ কিলোমিটার? একশ পঞ্চাশ-ষাটেই বলে এখন ভিরমি খাচ্ছি –

শিবশম্ভু – ইয়েস ম্যাম তা খাচ্ছি। তবে রোজ শিখছি। এই ট্রেন পুনে-মুম্বাই সেকশনে লোনাভালা এবং মুম্বাই-আমেদাবাদ সেকশনে সুরাট, ভারুচ, ভদোদরা স্টেশন যুক্ত করবে এবং ভবিষ্যতে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত যাবে বলে বলা হয়েছে। তবে এরই মধ্যে পরপর বেশ কিছু রেল-দুর্ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই না? (চান্দ্রেয়ীকে কিছু বলতে উদগ্রীব দেখে) তুমি কিছু বলবে চান্দ্রেয়ী?

চান্দ্রেয়ী – যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অবশ্যই অনেক উদ্যোগ অনেক সিটিতে নেওয়া হচ্ছে। যে না নেবে সে বিপদে পড়বে। মুম্বাইর উত্তর-পশ্চিম শহরতলীর সাথে দক্ষিণের নরিম্যান পয়েন্টকে যোগ করেছে বান্দ্রা-ওরলি সী লিঙ্ক রোড-ব্রিজ। আগে যে দূরত্ব পার হতে এক ঘন্টা লাগতো, সেই দূরত্ব পার হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ মিনিটে। আট লেনের এই রাস্তা মার্চ পুরোপুরি চালু। এটাও বড় শহরের যানবাহনের উন্নতির একটা খুব বড় উদ্যোগ তা মানতে হবে। তাই না?

সেঁজুতি– অবশ্যই, অবশ্যই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড মানছি। এবার এই গরম গরম মোমোগুলোর সৎকারে উদ্যোগ নেওয়া যাক।

[সবাই হেসে ওঠার মধ্য দিয়ে পর্বের সমাপ্তি।]

পর্ব – চার

[বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সেই রাস্তা, একটা শৃঙ্খলার পরিবেশ। এরই মাঝে -]

সৌম্য – অমিত বাড়ি ফিরবি তো? (রাস্তার দিকে তাকিয়ে) সেই গ্যাঞ্জামটা নেই, তাইনা রে?

অমিত – হ্যাঁরে। অনেক ডিসিপ্লিন্ড ট্র্যাফিক। পুলিশ, অফিসার, সার্জেন্টে গিজগিজ করছে! কেসটা কি?

সৌম্য – মনে হয় মন্ত্রি-টন্ত্রি যাবে। এতো পুলিশ! খুব ওজনদার কেউ যাবে হয়ত।

সৌম্য –হবে কেউ কেউকেটা। ওই যে তোর সেই বিপুল গায়েন। একাধারে পুলিশ আর ডাক্তার। সেদিন কী কনফিডেন্টলি বিনে পয়সায় ওষুধ আনালো বল!

অমিত – তা ঠিক। কোলকাতা পুলিশ ভার নেবার পর থেকে নাকি এখানে ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্টের উন্নতি হয়েছে স্যারেরা বলেন।

সৌম্য – পুরনো কথা টেনেই বলব, শহরের, স্পেশালি মেট্রোপলিটান সিটির যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ডিমান্ড করে উন্নত ট্র্যাফিক ম্যানেজমেন্ট। ঠিক কিনা বল?

অমিত – ট্রু, একবারে ঠিক। একটু দাঁড়াই। সেঁজুতি আসছে বলল। একসাথে ফিরবে।

সৌম্য – কেন একা যেতে পারবে না? স্ট্রেঞ্জ!

অমিত – নারে, সেদিনের পর এখনো কেমন যেন ট্রমাটাইজড! মা বলেছে আমার, তোর বা চান্দ্রেয়ীর সাথে যেন যাতায়াত করে।

সৌম্য – রিয়েলি? ভালো কথা, তুই সেদিন সেমিনারে ছিলি? মায়ের চড়নদার হয়ে আমাকে জ্যেঠুর ওখানে বর্ধমানে যেতেই হোল। মাকে যত বলি আমার ক্লাস আছে, তত বলে একদিন ক্লাস না করলে –

অমিত – নারে, আমার ওয়ার্কশপ ছিল। কাটাতে পারিনি। আর উদ্দালকদা যখন বললেন পুলিশ থেকে ডিসি ট্র্যাফিক আর ডিসি সাউথ আসবেন তখনই উৎসাহ চটকে গেল।

সৌম্য – চান্দ্রেয়ী উদ্দালকদার হাতে সান্যাল কাকুর নাম লিখে দিয়ে এলো তাও?

[সেঁজুতি এবং চান্দ্রেয়ী এল হাঁপাতে হাঁপাতে]

চান্দ্রেয়ী –(হাঁপাতে হাঁপাতে) ও চলে গেছে? তোদের দেখেছে?

সেঁজুতি – তোরা এসে গেছিস দাদা! ওরে বাবা এত পুলিশ কেন রে?

সৌম্য – শুনলাম তোকে আর অমিতকে ধরে নিয়ে যাবে। শেষবারের মতো আমাদের সবার জন্য চা বল।

সেঁজুতি – ইল্লি, আমার বয়েই গেছে তোদের চা খাওয়াতে। জানিস তো চান্দ্রেয়ী সেমিনারে গিয়েছিল।

অমিত – আর্কিটেকচারের নবনীতা ম্যাডাম নাকি মেট্রোপলিটান সিটির ট্র্যাফিক ইমপ্রুভমেন্টের ওপর দারুন বলেছেন। দুই ডিসি শুনে নাকি ফেলাট।

চান্দ্রেয়ী –(খানিকটা আত্মমগ্ন) সার্জেন্ট সান্যালও এসেছিলেন। না, যায় নি এখনো। আজ আসবে বলেছিল।

সৌম্য –চান্দ্রেয়ী ওভাবে কথা বলছিস কেন? ভূতে পেয়েছে নাকিরে? কে যায় নি, কে আসবে?

চান্দ্রেয়ী –সার্জেন্ট সান্যাল আজ গভর্নরের এস্কর্ট পাইলট।

সৌম্য – সে তুই জানলি কি করে? তোকে বলেছেন কাকু?

চান্দ্রেয়ী – (শান্তভাব বজায় রেখে) আমি জানি। ট্র্যাফিক থেকে ট্রান্সফারড। রাজভবনে পোস্টেড এখন।

[দূরে পুলিশ এস্কর্ট পাইলটের হুটার শোনা যাবে এবং বাড়বে ও মিলিয়ে যাবে। অমিতরা কাকু কাকু বলে ডাকবে। উত্তর পাবে না]

সৌম্য – যা বাব্বা, কাকু আমাদের দেখতেই পেলেন না!

অমিত – (খুব গম্ভীর হয়ে) একমিনিট, একমিনিট। তোরা সব একটুকু চুপ কর। আমারে একটা অঙ্ক মেলাবার দে রে অবসর।

সেঁজুতি – ইয়ে সব কেয়া হো রহা হ্যায়? আমার দাদাটা শেষের কবিতার ওমিট রে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

[দূরে দমকলের গাড়ীর ঘন্টা শোনা যাবে]

অমিত – (খুব গম্ভীর হয়ে) চান্দ্রেয়ী তোর হাইট কত? তোরা তো লাহিড়ী। তাই না?

চান্দ্রেয়ী – (শান্তভাব বজায় রেখে) পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি। আমি চান্দ্রেয়ী লাহিড়ী। কেন?

অমিত – (একটু উঁচু গলায়) হতেই হবে। সান্যাল ওদিকে, এদিকে লাহিড়ী। আবার এদিকে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি। ওদিকে হাইট সিক্স ফিট টু ইঞ্চেস্। আহা রে, আহা রে, মেড ফর ইচ আদার। এসেছে ভরসা এসেছে, হুলুরব করো বন্ধুরা।

[সৌম্য, সেঁজুতি - সে কীরে চান্দ্রেয়ী, ওরে বাবা একী শুনি। সব শব্দ ডুবিয়ে দমকলের গাড়ীর ঘন্টা বাজাতে বাজাতে চলে যাবে।]

সমাপ্তি